হাওরের বাস্তুসংস্থান ও খাদ্যশৃঙ্খল: ভেঙে পড়ার জন্য দায়ী কে?

পাভেল পার্থ

এমনিতেই হাওরের বাস্তুসংস্থান বিপর্যস্ত হয়েছে। হাওরের জটিল খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে। এভাবে ব্যাপক জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের করুণ মৃত্যু ঘটবে। এমনকি এক বিশাল জলজ প্রাণবৈচিত্র্য হাওর অঞ্চল থেকে বেঁচে থাকার জন্য অন্য কোনো অঞ্চলে স্থায়ী স্থানান্তর করতে পারে। তাহলে নতুন যে বসতিতে স্থানান্তর ঘটবে সেখানেও দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা ও টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। তার মানে হাওরের এই চলমান সংকট শুধুমাত্র হাওরের নয়, পুরো দেশকেই এক প্রতিবেশগত সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। .....

ধারের কাঁচি আন্যা মায়ে তুল্যা দিল হাতে
ক্ষেতে যাওরে পুত্র আমার ধান্য যে কাটিতে
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া
আশ্বিনা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান
এরে দেইখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরান
চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে
আইশনা পানিতে মাও সব শস্যি গেছে
মায়ে কান্দে পুত্রে কান্দে শিরে দিয়ে হাত
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত ॥
(মহুয়া পালা, মৈমনসিংহ গীতিকা)

হাওরাঞ্চল জন্ম দিয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকার। মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায় দেখা যায়, চান্দ বিনোদকে তার মা হাওরে ধান কাটতে পাঠায়, কিন্তু সব ধান তলিয়ে যায় আশ্বিনা পানির ঢলে। মৈমনসিংহ গীতিকার কোথাও বোরো মৌসুমে ধান তলিয়ে যাওয়ার কথা নেই। এমনকি 'আয়না বিবির পালায়' দেখা যায়, কিশোর কৃষক রাখাল মামুদ হালের বলদ নিয়ে বোরো মৌসুমের শাইল ধান কাটতে হাওরে যায়। সেখানে সে পাকা ধান পায়। চৈত্র-বৈশাখের পাহাড়ি ঢল নতুন নয়, কিন্তু পাহাড়ি ঢলে বোরো ধানের জমিন তলিয়ে যাওয়া আমন-আউশ মৌসুমের চেয়ে নতুন। কারণ হাওরে একচ্ছত্রভাবে বোরো মৌসুমে উফশী ধানের আবাদ শুরু হয়েছে খুবই নতুনভাবে। কারণ হাওরাঞ্চলের আদি বোরো ধান জাতগুলো সবই গভীর পানির ধান। কিন্তু কর্পোরেট উন্নয়নের ফাঁদে তথাকথিত সবুজ বিপবের নামে হাওরাঞ্চলও আজ ভরে উঠেছে উচ্চফলনশীল (উফশী) আর হাইব্রিড বীজে। হাওরাঞ্চলে আজ আমন, আউশ ঋতুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বোরো মৌসুম এবং বোরো মৌসুমে কর্পোরেট কোম্পানির সার-বিষ আর কৃষিযন্ত্রের বাণিজ্য চাঙ্গা রাখতে চাষ হচ্ছে খর্বাকৃতির উফশী ধান। এই ধান ঘরে তোলার আগেই অকালবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যায়। এভাবেই তলিয়ে গেছে দেশের হাওরাঞ্চলের বোরো মৌসুমের সব ধান জমিন। কেবল ধান নয়, তলিয়ে যাওয়া হাওরে প্রশ্নহীনভাবে মরছে জীবন। একের পর এক। মাছ, জলপোকা, জোঁক, হাঁস, মাকড় কি সাপ। লুটিয়ে পড়ছে জলজ তৃণগুল্মের শরীর। সবার চোখের সামনেই দুঃসহ এক যন্ত্রণা পাড়ি দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই করছে দেশের ছয় ভাগের এক ভাগ অঞ্চল। অথচ পুরো দেশ যেন কত সুখে আছে! রাষ্ট্র হাওরের চলমান দুঃসহ যন্ত্রণাকে দেখছে কেবলমাত্র বোরো মৌসুমের উফশী ধানের তলিয়ে যাওয়া থেকে। তর্ক উঠেছে ফসল রক্ষা বাঁধে কে কত দুর্নীতি করেছে। কে কতখানি গাফিলতি করেছে। কেউ কোনো দায় বা দায়িত্ব নিচ্ছে না। হাওর নিয়ে রাষ্ট্রের এই চিন্তা নতুন নয়, এভাবেই রাষ্ট্র হাওরকে অবহেলা করে। অন্যায় আচরণ করে। পাহাড়ি ঢলের তলায় বোরো মৌসুমের উফশী জাতের ধানগাছগুলো পুষ্ট কি অপুষ্ট দানা নিয়ে ডুবে গেছে। এসব উফশী জাতের ধান খর্বাকৃতির। পাহাড়ির ঢলের তলে মুহূর্তেই ডুবে যায়। জলের তলায় বেশি সময় জীবিত থাকতে পারে না। ঢলের জল ঠেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। কারণ এসব ধানগাছকে এভাবেই বানানো হয়েছে।

হাওরাঞ্চলে আজ আমন, আউশ ঋতুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বোরো মৌসুম এবং বোরো মৌসুমে কর্পোরেট কোম্পানির সার-বিষ আর কৃষিযন্ত্রের বাণিজ্য চাঙ্গা রাখতে চাষ হচ্ছে খর্বাকৃতির উফশী ধান। এই ধান ঘরে তোলার আগেই অকালবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যায়।

তো জলের তলায় ধানগাছ মরে জলকে দূষিত করছে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেছে। মাছসহ জলজ প্রাণগুলো জলের তলায় অক্সিজেনস্বল্পতায় টিকে থাকতে পারছে না। ফলে মরেছে। জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের এমন করুণ মৃত্যু আমরা দেখেছিলাম সুন্দরবনের নদীতে তেলবোঝাই জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। পানির ওপরে তেলের আস্তরণ পড়েছিল। কিন্তু সুন্দরবনের নদী ছিল জোয়ার-ভাটার নদী। ছিল সমুদ্রের কাছাকাছি। জলপ্রবাহে তেমন কোনো অভ্যন্তরীণ বাধা ছিল না। সুন্দরবন সেই দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণা সামাল দিয়েছিল। কিন্তু হাওর-ভাটি এই দূষণ কিভাবে সামলাবে? এখানে জোয়ার-ভাটা নেই। চারদিকে প্লাবিত হয়ে একটা জলাবদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এছাড়া হাওরের চারধার জুড়ে উজান কি ভাটিতে নানা কিসিমের বাঁধ আছে। আছে নানা ধরনের অবকাঠামো। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় পাহাড় থেকে আসা বালি ও পাথরে ঢাকা পড়ে আছে হাওর। হাওরবাসীর অভিধানে বলে 'হাওর মুইঞ্জ্যা গেছে'। এই মুইঞ্জ্যা যাওয়া হাওরে পাহাড়ি ঢলের জল ধরে রাখার জায়গা নেই। তাই চারদিকে ছড়িয়ে পাবিত হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। হাওর কেবল মানুষের জন্যই এখন খাদ্যহীন অঞ্চল নয়। এখানে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির খাবারও তলিয়ে গেছে। কেবল মানুষ বা গৃহপালিত প্রাণসম্পদ নয়, হাওরের প্রাকৃতিক প্রাণবৈচিত্র্যও এক চরম খাদ্যসংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থা আরো বেশি দিন চলতে থাকলে হাওর অঞ্চল এক গভীরতর প্রতিবেশগত সংকটে পড়তে বাধ্য হবে। এমনিতেই হাওরের বাস্তুসংস্থান বিপর্যস্ত হয়েছে। হাওরের জটিল খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে। এভাবে ব্যাপক জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের করুণ মৃত্যু ঘটবে। এমনকি এক বিশাল জলজ প্রাণবৈচিত্র্য হাওর অঞ্চল থেকে বেঁচে থাকার জন্য অন্য কোনো অঞ্চলে স্থায়ী স্থানান্তর করতে পারে। তাহলে নতুন যে বসতিতে স্থানান্তর ঘটবে সেখানেও দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা ও টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। তার মানে হাওরের এই চলমান সংকট শুধুমাত্র হাওরের নয়, পুরো দেশকেই এক প্রতিবেশগত সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে।

আমরা রাষ্ট্র ভাগ করতে পারি, দেশ ভাগ করতে পারি, মন্ত্রণালয় ভাগ করতে পারি; কিন্তু বাস্তুসংস্থান ভাগ করা যায় না। খাদ্যশৃঙ্খল জোর করে পাল্টে দেয়া যায় না। এটি প্রকৃতির জটিল নিয়মে হাজার বছর ধরে তৈরি হয় এবং রূপান্তরিত হতে থাকে নিজের এক আশ্চর্য টিকে থাকার ব্যাকরণে। হাওরাঞ্চলে টিকে থাকার ব্যাকরণ আজ এক নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় পুরো বিষয়টিকে আমরা কিভাবে দেখব? কয়েক হাজার মেট্রিক টন চাল এবং কয়েক বান্ডেল টিন বা লাখো কোটি টাকার অঙ্কে? এত কিছু মানুষের শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ক্ষুধা নিবারণের উপায় মাত্র। হাওরের গবাদি প্রাণসম্পদ থেকে শুরু করে বুনো প্রাণবৈচিত্র্য–এদের জন্য কী ক্ষতিপূরণ দেবে রাষ্ট্র? কিভাবে দেবে? রাষ্ট্র তো ঘোষণা করেছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। নিহত মাছদের কী হবে? মাছদের জন্য কি কোনো সরকার নেই? রাষ্ট্রের কলিজায় কি নিহত মাছদের প্রতি কোনো বেদনা নেই?

২.

বাংলাদেশে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড দেশে ৪১৪টি হাওর আছে বলে তাদের এক দলিলে উল্লেখ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে বাংলাদেশে ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৪২৩টি হাওর রয়েছে। এইসব হাওরের সম্মিলিত আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এগুলো সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৪৮টি উপজেলায় বিস্তৃত। দেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ জুড়ে এই হাওরাঞ্চলে প্রায় কয়েক কোটি মানুষের বসবাস। এককভাবে হাওরাঞ্চল হলেও প্রতিটি হাওরই ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুসংস্থান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা অঞ্চলের হাওরগুলোর ভেতর প্রতিবেশগত কিছু মিল আছে। যেমন–মৌলভীবাজার ও সিলেটের বেশ কিছু হাওর বৈশিষ্ট্যে প্রায় একই রকম। আবার হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলের মধ্যে অনেক মিল। তার পরও সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা ও মৌলভীবাজারের যে হাওরগুলো উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তসংলগ্ন এবং পাহাড় টিলা বনের কাছাকাছি সেই হাওরগুলো আবার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজিত। এসব হাওরে এখনও অনেক জলাবন আছে। এমনকি গভীর পানির ধান জাতগুলোর টিকে থাকার ইতিহাসও এসব অঞ্চলে সুপ্রাচীন। হাওর থেকে একেবারেই উধাও হয়ে যাওয়া একটি মাছের নাম নানিদ। নল-নটাবনের ধারে নাভিতে আঙুল ঢুকিয়ে নানিদ মাছ ধরার এক আদি কায়দা দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে। হাওরের চিতল, বাঘাইড়, মহাশোল, বেরকুল, এলং, বামস, রানি, আলুনি, সিলং, বাছা, ঘাইড়া, চিরাই, দেশি পাঙ্গাস, গাং মাগুর, কোটা কুমিরের খিল, ঘাঘলা, ঘোড়ামুখ, রিঠা, আগুনচোখা, আইড়, গুতুম–মাছগুলোও হাওর থেকে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। চলতি সময়ে হাওরে যেভাবে মরছে মাছ তাতে কতগুলো প্রজাতি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে কে জানে। অধিকাংশ মাছ মরছে হাঁ করে। মানে পানিতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকু পায়নি এসব অভাগা মাছ। এমনকি হতে পারে তলিয়ে যাওয়া পানিতে ধানগাছগুলো পচে পানিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করছে, যাতে মাছসহ জলজ জীবের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার ধারাম ও কাইঞ্জ্যা হাওর এবং ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের ডিঙ্গাপোতা হাওরের বিভিন্ন পয়েন্টের পানি পরীক্ষা করে। তারা দেখতে পায়, হাওরের প্রতি লিটার পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নেমে এসেছে ৫ মিলিগ্রাম এবং অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়েছে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ থেকে ১ মিলিগ্রাম। মাছসহ জলজ জীবের টিকে থাকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে অক্সিজেন থাকা জরুরি ৬ মিলিগ্রামের বেশি এবং অ্যামোনিয়া ০.০০২ মিলিগ্রাম। কেবলমাত্র সুনামগঞ্জ বা নেত্রকোনা নয়, মাছ মরছে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট কি কিশোরগঞ্জ জুড়ে।

৩.

চলতি সময়ে হাওরের মাছসহ জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের এই করুণ মৃত্যুকে শুধুমাত্র পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন আর অ্যামোনিয়ার পরিমাণ দিয়েই কি দেখা হবে? ভয়াবহভাবে মাছের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জের হাওরে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি। বাংলাদেশের এক প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চল। হাকালুকি, হাইল, কাউয়াদীঘি কি ঘুইঙ্গ্যাজুড়ির মতো হাওরগুলো মূলত দেশের চা-বাগান অঞ্চলে অবস্থিত। চা-বাগানে মনসান্টো কোম্পানির রাউন্ড-আপসহ নানা কোম্পানির আগাছানাশক ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় নানা রাসায়নিক বিষ। বৃষ্টিপাতের ফলে চা-বাগান ধোয়া পানি এসে সব সময়ই এসব হাওরে গড়ায়। এর আগেও হাকালুকি ও হাইল হাওরে মাছদের মৃত্যু ঘটেছে। এ বছর মাছদের মৃত্যুর সাথে চা-বাগানে ব্যবহৃত বিষ জড়িত কি না এটিও খতিয়ে দেখা জরুরি। অনেকে বলছেন হাওরের জমিতে বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য জমিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহৃত হয়। এই সার ও বিষই পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে পানিকে দূষিত করছে। কারণ এটি তো ঠিক, দেশের হাওরাঞ্চলে সিনজেন্টা কোম্পানির আগাছানাশক রিফিট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। কৃষিজমিনে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও বিষ এই মাছের মৃত্যুর জন্য দায়ী কি না এটিও খতিয়ে দেখা জরুরি।

হাকালুকি, হাইল, কাউয়াদীঘি কি ঘুইঙ্গ্যাজুড়ির মতো হাওরগুলো মূলত দেশের চা-বাগান অঞ্চলে অবস্থিত। চা-বাগানে মনসান্টো কোম্পানির রাউন্ড-আপসহ নানা কোম্পানির আগাছানাশক ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত হয় নানা রাসায়নিক বিষ। বৃষ্টিপাতের ফলে চা-বাগান ধোয়া পানি এসে সব সময়ই এসব হাওরে গড়ায়।

৪.

তলিয়ে যাওয়া হাওরে ধানগাছ পচে অ্যামোনিয়া ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের তারতম্য, চা-বাগানের বিষ, কৃষিজমির সার-বিষ–এসব হয়তো এবারের মাছসহ জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু আর কিছু? ২০০৭ সালে সুনামগঞ্জের মাটিয়ান হাওর ও শনির হাওরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে মরেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। ঘইন্যা মাছের সংখ্যা ছিল বেশি। ২০০৮ সালে আবার মরেছিল ঘইন্যা মাছ। হাওরবাসী প্রতিবাদ করেছিল মেঘালয় পাহাড়ের খনি এলাকা থেকে দূষিত পানি এসে নদী ও হাওরের মাছদের মেরে ফেলেছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় পাহাড়ে আছে অপরিকল্পিত নানা খনি এলাকা। কয়লা খনি, চুনাপাথর খনি থেকে শুরু করে ইউরেনিয়াম খনি। কয়লা খনির সালফারসহ বর্জ্য পানিতে সীমান্তবর্তী হাওরের মাছ ও জলজ জীবের মৃত্যু প্রায়ই ঘটে থাকে। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের ত্বকের রোগসহ নানা রোগ হয়। বাকি রইল ইউরেনিয়াম খনি। এর বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিবেশবাদী ও আদিবাসী সংগঠনগুলো আন্দোলন করছে। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চল থেকে এই খনি অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার। তবে পশ্চিম খাসি পাহাড়ের এই অঞ্চল থেকেই

নেমেছে শতসহস্র পাহাড়ি ছড়া। ভুরুঙ্গাছড়া, লাকমাছড়া, নয়াছড়া, পাগলাছড়া, গারোছড়া, রাজাইছড়া–এরকম নানা নামের পাহাড়ি ছড়া। এসব পাহাড়ি ছড়াই নেমে এসেছে টাঙ্গুয়ার হাওর, সজনার হাওর কি শনির হাওরে। এসব পাহাড়ি ছড়া থেকেই জন্ম নিয়েছে হাওরের নদী রক্তি, পাটলাই কি যাদুকাটা। পশ্চিম খাসি পাহাড়ের ইউরেনিয়াম খনির বর্জ্য দূষণে এবারের মাছদের মৃত্যু ঘটছে কি না এটিও খতিয়ে দেখা জরুরি।

৫.

হাওরের এক গভীর পানির ধানের নাম বইয়াখাউরি। মানে যে ধান বুনে ঘরে বসে বসে নিশ্চিন্তে খাওয়াদাওয়া করা যায়। পাকলে কেটে আনা যায়। কেবলমাত্র বইয়াখাউরি নয়, এককালে হাওরে জন্মাত টেপি, বোরো, রাতা, শাইল, লাখাই, মুরালি, চেংড়ি, সমুদ্রফেনা, হাসিকলমি, কাশিয়াবিন্ন, দুধলাকি, দুধসাগর, লাটলি, মারতি, তুলসীমালা, আখনিশাইল, গাছমালা, খৈয়াবোরো, রাতাশাইল, দেউড়ি, কন্যাশাইল, বিচিবোরো, লোলাটেপি, পশুশাইল, হাঁসের ডিম, গুয়ারশাইল, বেতি, ময়নাশাইল, গদালাকি, বিরঅইন, খিলই, ছিরমইন, আগুনি, গুলটিহি, ল্যাঠা, জাগলিবোরোর মতো অবিস্মরণীয় সব গভীর পানির ধান জাত। উপমহাদেশের প্রথম গভীর পানির ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে হাওরের হবিগঞ্জ জেলার নাগুড়াতে। প্রশ্নহীনভাবে সেই প্রতিষ্ঠানকে বদলে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র। গবেষণা ও উন্নয়নের নাম করে গভীর পানির ধান জাতগুলো ডাকাতি করেছে ফিলিপাইনে অবস্থিত (ইরি) ও সিজিআইএআরের মতো প্রতিষ্ঠান। দেশের সকল হাওরে রাষ্ট্র জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে খর্বাকৃতির উফশী ধানের জাত। উফশী জাতগুলো পাহাড়ি ঢলের সাথে পাল্লা দিতে পারে না, মরে যায়, ডুবে যায়। আর ডুবে পচে কী হতে পারে, এবার মাছসহ জলজ জীবের মৃত্যু থেকে নিশ্চয়ই আমরা কিছুটা হলেও টের পাচ্ছি। তার মানে হাওরের এই সংকটটি কেবলমাত্র ফসল রক্ষা বাঁধ বা বাঁধের দুর্নীতি ঘিরে নয়; এর সাথে জড়িয়ে আছে হাওরের ঐতিহাসিক বাস্তুসংস্থান ও খাদ্যশৃঙ্খল বিতর্ক। এসব বিতর্ক এড়িয়ে কোনোভাবেই হাওরজীবনের সুরক্ষা সম্ভব নয়। হাওরে মাছসহ জলজ জীবের মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিশ্চয়ই রাষ্ট্র এই তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের সার-বিষনির্ভর উফশী ধান আবাদের বিষয়টিও খতিয়ে দেখবে।

> উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় পাহাড়ে আছে অপরিকল্পিত নানা খনি এলাকা। কয়লা খনি, চুনাপাথর খনি থেকে শুরু করে ইউরেনিয়াম খনি। কয়লা খনির সালফারসহ বর্জ্য পানিতে সীমান্তবর্তী হাওরের মাছ ও জলজ জীবের মৃত্যু প্রায়ই ঘটে থাকে।

৬.

দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ হাওর সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়া। জাতিসংঘ ঘোষিত রামসার অঞ্চল। মৌলভীবাজারের হাকালুকি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা। পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাওয়া এসব হাওর আজ গভীর দুঃসহ যন্ত্রণা পাড়ি দিচ্ছে। বাস্তুসংস্থান ভেঙে পড়ছে, খাদ্যশৃঙ্খল উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। অথচ জাতিসংঘ বা দেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয় এ নিয়ে কোনো কথা বলছে না। কোনো বিশেষ সতর্কতা বা তৎপরতা দেখাচ্ছে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের চলমান নিশ্চুপতা দেশীয় পরিবেশ আইন থেকে শুরু করে জাতিসংঘের প্রাণবৈচিত্র্য সনদের নীতি লঙ্ঘন করে চলেছে। হাওরবাসী বাঙালিরা টাঙ্গুয়ার হাওর বললেও স্থানীয় হাজং আদিবাসীদের কাছে এই হাওরের নাম 'তিনকুইন্নে আরনি' এবং মান্দিরা বলেন 'হাওয়াল দালগিবা'। টাঙ্গুয়ার হাওরের আলংয়ের ডুয়ার, পাইন্যাখালী বাগ ও বিনোদপুর বাগ বিরল প্রাণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চল। এরকম বিশেষ অঞ্চল দেশের সকল হাওরেই আছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যদি আবদ্ধ পানি দূষিত হয়ে থাকে তাহলে হাওরের এমন বিশেষ অঞ্চলগুলো গভীর সংকটে পড়তে পারে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তা পানির ফাইটোপ্লাংকটন ও জুওপ্লাংকটনকে মেরে ফেলবে। হাওরের খাদ্যশৃঙ্খলের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী অণুজীবের মৃত্যু ঘটলে তা একে একে খাদ্যস্তরের সকল জীবকেই সংকটে ফেলবে। যার সুদূরপ্রসারী যন্ত্রণা প্রথমত সামাল দিতে হবে হাওরবাসী মানুষকে। এমনকি বর্তমানে পানির এই দূষণ হাওরের বুনোগোলাপ কি বুনো স্ট্রবেরির ঝোপের মতো বিশেষ উদ্ভিদ জাতগুলোকেও শেষ করে দিতে পারে। তাহলে আমরা এ অবস্থায় কী করব? দায়দায়িত্ব সব জলের তলায় ডুবিয়ে না রেখে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এই সংকটকালে সক্রিয় হতে পারে। দেশের নানা প্রান্তের হাওরবাসীসহ হাওরের নানা বিষয়ে কর্মরত গবেষক, জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়, গণমাধ্যম ও কর্মিদলের সমন্বয়ে এই সংকট সুরাহার নীতি তৈরি করতে পারে। হাওরের এ সংকট তো উজান-ভাটির পানিপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল, তাই সংকটটিকে আন্তঃরাষ্ট্রিক বিষয় হিসেবেই বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হাওরের ধান, মাছ, মাটি, মানুষ, গান–সব কিছু নিয়েই পাহাড়ি ঢলের এই তলিয়ে যাওয়া সংকটের সুরাহা করতে হবে। হাওরের বাস্তুসংস্থান কি খাদ্যশৃঙ্খলার জটিল গণিতকে বোঝার জন্য দাঁড়াতে হবে হাওরের চলমান জনজীবনের সংগ্রামী তলে। কত হেক্টর জমি তল হয়েছে, কতগুলো মাছ মরেছে–এ ধরনের সংখ্যার তর্ক থেকে হাওরের যন্ত্রণাকে বোঝা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ▣
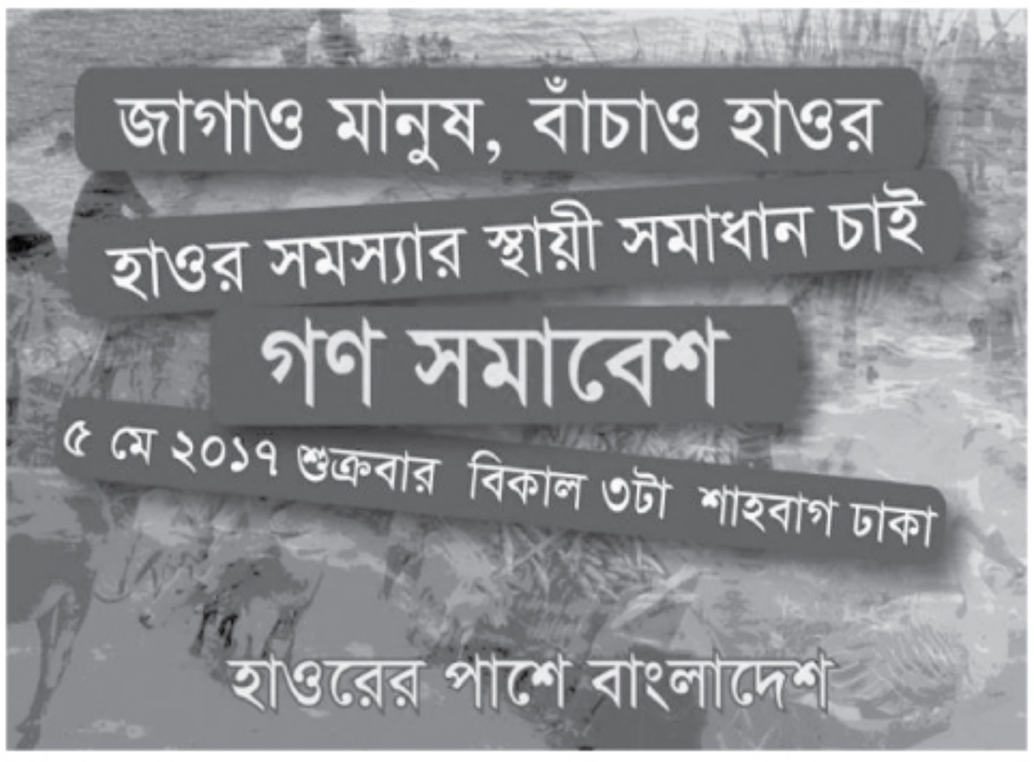
পাভেল পার্থ: গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
ই-মেইল: animistbangla@yahoo.com